শিকারী

যুথিকা বড়ুয়া

(এক)

পার্ট টাইম হলেও ডিপার্টমেন্ট ষ্টোরে কাজ করতে বেশ ভালোই লাগত। ঐ ষ্টোরে আমরা মোট আঠারো জন কর্মচারী ছিলাম। তিনটে করে শিপ্ট্, এক একটা শীপ্টে আমরা ছ'জন কাজ করতাম। আর এক ইটালিয়ান ভদ্রলোক ছিলেন ষ্টোরের ম্যানেজার। ঠিক বছর খানিক পর লক্ষ্য করলাম, নতুন সাজ-সজ্জায় এবং সুন্দর ব্যবস্থাপনায় ষ্টোরের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। বদলে গেল ক'য়েকজন কর্মচারী এবং ম্যানেজার। ভাবলাম, ষ্টোরের মালিক বোধহয় পুরোনো কর্মচারীদের বিদায় দিয়ে নতুন লোক হায়ার করছেন। কিন্তু মাসখানিক কেটে যাবার পরও তেমন কোনো নোটিশ আমরা পেলাম না। ম্যানেজারের মতিগতীও কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। মনে মনে ভীষণ টেন্শনে থাকতাম।

একদিন হঠাৎ নতুন ম্যানেজার এ্যন্থনি লরেন্স আমাকে আর্জেন্ট ডেকে পাঠালেন। আমি তো শুনেই ঘাবড়ে গেলাম। একেই নতুন মানুষ। দরাজ গুর"গম্ভীর তার কণ্ঠস্বর। যেমন দৈত্যের মতো বিশাল লম্বা চেহারা, তেমনি হ্যান্ডসাম, গৌরবর্ণের উজ্জ্বল সুদর্শণ মার্জিত পুর"ষ। একবার চোখ পড়লে আর পলক পড়ে না। বেশ হৃদয়াকর্ষক চেহারা। অথচ তার সন্নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেই গা কেঁপে ওঠে।

গেলাম মন্ত্রের মতো জপতে জপতে, এবার আমাকেও নিশ্চয়ই বিদায় করে দেবেন বোধহয়! এই আশংক্ষায় হৃৎস্পন্দনটা আরো দ্র"তগতীতে চলতে লাগল। কিন্তু গিয়ে দেখি, অফিস ঘরের দরজাটা আলতোভাবে বন্ধ। ভিতর থেকে ভেসে আসছে মহিলা কণ্ঠস্বর। হাসি-কলোতান। কখনো হাস্যরোলের ধ্বনী প্রতিঃধ্বনীত হয়ে বদ্ধ দরজা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে বাইরে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। হতভম্বের মতো হাঁ করে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। কি করবো, মনস্থিরই করতে পাচ্ছিনা। ভিতরে বেশ জমিয়ে আড্ডা চলছে, বোঝা যাচ্ছে। ডিস্টার্ভ করাটা কি ঠিক হবে! নাঃ ফিরেই যাই! কিন্তু পরক্ষণেই স্বভাবসুলভ কারণে উক্ত মহিলাটিকেও স্বচোক্ষে দেখবার বড় কৌতূহল হলো, কে এই মহিলা! তার বদনখানি একটু দেখি! হাসির ফোয়ারায় একেবারে দেওয়াল কেঁপে উঠছে! রীতিমতো আড্ডাখানা বানিয়ে দিয়েছে। পাড়ার ক্লাবঘরও হার মেনে যাবে!

মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে দরজাটা নক্ করে ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। ঢুকেই চমকে উঠি। স্ড্ডম্ভিত হয়ে যাই বিস্ময়ে। বোবার মতো নির্বাক দৃষ্টিতে হাঁ করে চেয়ে থাকি। -এ কি, আমাদের সহকর্মী লিলি যে! ও'এখানে কি করছে! ম্যানেজারের এতো ঘনিষ্ঠ হলো কবে থেকে ও'! কখনো তো কথাবার্তাও বলতে দেখিনি! দু'জনেই নিউকামার। এসেছেও কয়েকদিন হয়েছে মাত্র! ওকে একেবারে দুইবাহুতে আলিঙ্গন করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দু'চোখের দৃষ্টি মেলে ম্যানেজার এ্যন্থনি আস্বাদন করছে, সৌন্দর্য্যের পারিজাত লিলির বাঁধ ভাঙ্গা উত্তাল যৌবনের চমকপ্রদ রূপ, রং আর রস। একেবারে রোমিও-জুলিয়েটের মতো প্রেমলীলায় মশগুল হয়ে আছে দুজনে! আশ্চর্য্য, ওরা কি প্রেমে পড়ে গেল না কি! দূর, পড়লে পড়ুক গে! আমার কি! যে খাবে সে হজম করবে! কিন্তু ম্যানেজার এ্যন্থনি একজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি হয়ে তার এই অভির"চী? এই তার অভিব্যক্তির পরিচয়? বেহায়ার মতো একজন মহিলা কর্মচারীর সাথে অবৈধভাবে এধরণের বিহেইভ তার মোটেই শোভা পায় না! বললাম মনে মনে।

ইতিপূর্বে হাওয়ার গতীতে ছুটে বেরিয়ে গেল লিলি। লক্ষ্য করলাম, অপ্রস্তুত ম্যানেজার এ্যন্থনিও হঠাৎ আমার উপস্থিতিতে থতমত খেয়ে গেলেন। নড়ে চড়ে বসে একটা ঢোক গিলে আমায় বললেন,-'সরি ম্যাডাম, ভেরী বিজি নাউ! কাম লেইটার!'

-'ও.কে স্যার!' বলে অফিসঘর থেকে দ্র"ত বেরিয়ে এলাম। বেরিয়েই দেখি, দরজায় ঠেকান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিলি। আহালণ্ঢাদে যেন ফেটে পড়ছে। উচ্ছাসিত চোখে কিছু বলার ব্যকুলতায় উৎফুলণ্ঢ হয়ে দাঁতকপাটি বার করে নৈঃশব্দে মুখ টিপে হাসছে।

দেখে পিত্তি জ্বলে উঠল আমার। সর্বাঙ্গ রি রি করছে রাগে। কেমন ভদ্রলোক এরা! সাধারণ ভদ্রতাটুকুও ওদের নেই! অন্তত চক্ষুলজ্জাও তো একটু থাকে মানুষের!

বার বার ক্ষণপূর্বের রোমান্টিক দৃশ্যটি মনঃশ্চক্ষে ভেসে উঠতে লাগল। কেমন নির্লজ্জ বেহায়ার মতো অসংযত অবস্থায় ম্যানেজার এ্যন্থনির পেশীবহুল বাহুদ্বয়ের উষ্ণ আলিঙ্গনে গভীরভাবে লিপ্ত হয়েছিল লিলি। হয়ত বা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক রোমাঞ্চকর উন্মাদনায় মেতে উঠত দুজনে! তন্ময় হয়ে ডুবে যেতো, ক্ষণিক সুখের অতল গহ্বরে! তা কে জানতো!

হঠাৎ দরজাটা খুলতেই প্রেমালিঙ্গনে বন্দিনী লিলি, হকচকিয়ে গিয়েছিল। ঝড়ের বেগে দ্রুত ছুটে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। এখন দেখছি, ওর দু'কানই কাটা! লজ্জা শরমের বিন্দুমাত্রও বালাই নেই!

পরদিন যথারীতি ষ্টোরে প্রবেশ করে কর্মচারী ডেভিট আর নাতাশার কানাঘূষোয় অবগত হলাম, লিলি শিপ্ট্ চেঞ্জ্ করেছে। মর্নিং-শিপ্টে কাজ করবে। ভাবলাম, তা'হলে তো ওর পোয়া বারো! আফ্টারনুনের আগে কাষ্টোমারদের খুব একটা ভীড় হয় না। বিকেল পর্যন্ত ফাঁকাই থাকে প্রায়। চলবে পুরোদমে অভিসার। চুটিয়ে প্রেম করবে দুজনে, রোমাঞ্চ করবে, আরো কত কি!

অথচ সেদিনের পর থেকেই দৃষ্টিগোচর হয়, ম্যানেজার এ্যন্থনির অভাবনীয় পরিবর্তন। যেন এক নতুন মানুষ। সারাদিন অন্যমনস্ক, উদাসীনভাব। কিসের চিন্তায় যেন ডুবে থাকে। গলা দিয়ে আওয়াজই বের হয় না। একদম নরম হয়ে গিয়েছে। কথা বলে অত্যন্ত ক্ষীণ শব্দে।

সাধারণত যুবতী রমণীরাই অনধিকার চর্চায় একটু মাথা ঘামায় বেশী। তেমনি কৌতূহলও। বিশেষ করে প্রণয়মূলক ব্যাপারে। কোনপ্রকারে ইঙ্গিত একটা পেলেই হ'ল, সত্য উদ্ঘাটন না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পায় না কেউ! হঠাৎ বিনা নোটিশে রাতারাতি চব্বিশঘন্টার মধ্যে লিলির শিপ্ট্ পরিবর্তন, ম্যানেজার এ্যন্থনির মন-মানসিকতার পরিবর্তন শুধু বিস্ময়করই নয়, রীতিমতো রহস্যজনকও বটে! সন্দেহ ক্রমশই ঘনীভূত হতে থাকে আমার। ব্যাপারটা কি!

একদিন ষ্টোরে ঢুকতেই অপ্রত্যাশিতভাবে মুখোমুখি দেখা লিলির সাথে। আমি ঢুকছি, ও' বেরুচ্ছে। চোখে চোখ পড়তেই ফিক্ করে হেসে ফেলল লিলি। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর মুখদর্শণ না করেই আমিও অস্ফুষ্ট হেসে ফেলি। তা দেখে সুপ্রসন্ন হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল লিলি। লজ্জা আর আবেগের সংমিশ্রণে চোখের তারাদু'টি ওর উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে উঠল। চেহারায় এতটুকু মলিনতার ছাপ নেই। একগাল অনাবিল হাসি ছড়িয়ে উৎফুলণ্ঢ হয়ে বলল,-'হায়, হাউ আর ইউ? তুমি বাঙ্গালী আছো না?'

স্ববিস্ময়ে আমিও পাল্টা প্রশ্ন করলাম ওকে। উত্তরে 'নেহি' বলে হঠাৎ আমাকে চমকৃত করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলতে থাকে। -'হাঁ তোমার কোতার এ্যাক্সেন্টেই হামি বুঝে লিয়েচি! হাম্লোগ মারাঠি আছি! প্যায়দা হইচি কলকাত্তায়। বাংলা স্কুলে পাঁচ সাল পড়েছি! বহত দিন ছিলাম কলকাত্তায় মায়ের সঙ্গে! এ্যখনও থোড়া থোড়া এয়াদ আছে সব! ভুলা নেহি!'

ওর কথা শুনে বড্ড কৌতূহল হ'ল। জিজ্ঞেস করলাম, -'ম্যানেজার এ্যন্থনি তোমার কে হয়?'

আনন্দে উৎফুলণ্ঢ উঠল লিলি। মনে হলো, এই প্রশ্নটির জন্যই অপেক্ষা করছিল ও'! আহালণ্ঢাদে গদগদ হয়ে একগাল অনিন্দ্য সুন্দর হাসি ছড়িয়ে বলল, -'ও হামার রিলেটিভ্ আছে!'

জানতে চাইলাম ম্যানেজার ইন্ডিয়ান কিনা। কিছুক্ষণ থেমে চোখ মুখের ইশারায় বলল,-'জলদি যাও ব্যাহেনজী! উদেখো, ম্যানেজার সাহাব খাড়া হ্যায় উধার! ও জরুর হামাদের ওয়াচ্ করছে!'

আমি তৎক্ষাণাৎ অবিলম্বে ঢুকে পড়লাম ষ্টোরে। কিন্তু যতক্ষণ কাজে ছিলাম, শুধু লিলির কথাই ভাবছিলাম। আধো আধো বাংলা বলছিল, দারুণ লাগছিল শুনতে। কিন্তু যতটা অনুমান করেছিলাম, ততটা খারাপ ও নয়! বেশ মিশুকে মেয়েটা! কথায় কথায় হাসে। সেইসঙ্গে কথাবার্তায় সরলতা আর আবেগের প্রবণতাও কম নয়! মানুষকে কনভিন্স করবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে ওর। অথচ দেখে বোঝার উপায় নেই। যা অত্যাশ্চর্য্যজনকভাবে আমাকেও আবিষ্ট করে রেখেছিল। দেখতে

খুউবই সুন্দরী। হরিণের মতো ওর আঁখিপলণ্ব। তীক্ষ্ণ নাসিকা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখের চাহনি। শ্বেতাঙ্গদের মতোই দুধসাদা গায়ের রং। টোলপড়া গোলাপ গালের বাঁ-পাশে ঝুলে আছে একগোছা কালো রেশমী চুল। চিবুকের উপরে বড় একটা কালো তিল। যেমন শরীরের গড়ন, সরু কোমরের খাঁজ এবং নিখুঁত নিতম্ব, তেমনি যৌবন যেন ওর উপছে পড়ছে। প্রজাপতির মতো চঞ্চল, উচ্ছলতা এবং মায়ামৃগের মতো প্রাণবন্ড় পদচারণায় অপূর্ব লাগে ওকে। মহিলা হয়ে আমিই নজর ফেরাতে পারি না, আর ম্যানেজার এ্যান্থনি লরেন্সের মতো একজন তরুণ সৌন্দর্য্যপ্রেমিক লিলির প্রেমজ্বালে বশীভূত হওয়া খুবই স্বাভাবিক! শুধু এ্যান্থনি কেন, যে কোনো পুরুষমানুষকেই পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে চুম্বকের মতো আকর্ষিত করবে, তাদের হৃদয় হরণ করবে, তা একেবারে নিশ্চিত! অবধারিত!

কিন্তু প্রথম আলাপেই ওর সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে, তা কখনোই ভাবতে পারিনি। ভাবতে পারিনি, ওকে আমি অন্ড়র দিয়ে ভালোবেসে ফেলবো। ওর প্রতি আমার যে একটা খারাপ ধারণা জন্মেছিল, সেটাও নিমেষে বিনষ্ট হয়ে গেল।

সেদিনের পর থেকে প্রায়ই দেখা হতো লিলির সাথে। বন্ধুত্বের সৌজন্যে হায় হ্যালো বলে কুশল বিনিময় করাটা একটা রুটিন হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মধ্যে দেখতাম, লিলি বাড়িই যেতো না! ম্যানেজারের ব্যক্তিগত ফাই-ফরমাইশও ওকে খাটতে হতো। কোন কোনদিন গল্প করেই সময় কাটিয়ে দিতো। জীবনে ও' অনেক সংগ্রাম করেছে। অতীতের ভাগ্যবিড়ম্বণায় পদে পদে অপদস্থ হয়ে, দারিদ্রপীড়িত জীবনের সংঘর্ষে নানান বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ওকে বহু কষ্টও স্বীকার করতে হয়েছে। জীবনে অনেক হোঁচট খেতে হয়েছে। আজ সমস্ড় বাঁধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে মঞ্জিল ওর হাতের মুঠোয়।

একদিন নোটিশ করলাম, অপ্রাসঙ্গিকভাবে বার বার স্বামীর প্রসঙ্গই টেনে আনছে লিলি। স্বামীই ওর আলচ্যের একমাত্র মূল বিষয়। যার প্রশংসায় ও' একেবারে পঞ্চমুখ। শুধু জীবন দেবতাই নয়, ওর প্রাণপ্রতিম, প্রাণেশ্বর, প্রেমের পূজারী। যিনি প্রথম প্রেম নিবেদনে সহৃদয়ে লিলির স্বোয়াগত করেছিল হীরার নেক্লেস গলায় পড়িয়ে। খুউব রীচ ম্যান্, উচ্চবিত্ত খান্দানি বংশের একমাত্র উল্টরাধিকারী। লা-জবাব, হ্যান্ডসাম্ ওর স্বামী। দুইখানা ফাইভ-ষ্টার হোটেলের মালিক। ফিল্ম-ষ্টারদের মতো চেহারা। যে কোনো মেয়েই প্রেমের পত্তনে ওর দেওয়ানা হয়ে যায়। কিন্তু লিলিই ওর স্বামীর একমাত্র ভালোবাসার ফুল। স্বামীর চোখের মণী। আর স্বামী ওর জান। যে ব্যক্তি পর নারীর মুখদর্শণ করা তো দূর, কখনো না কি তাদের ছায়াও স্পর্শ করেন না।

একদিন লিলির জীবন কাহিনীর পূনরাবৃত্তি শুনতে শুনতে খুব ঈর্ষা হলো মনে মনে। বিধাতার উপরেও প্রচন্ড রাগ হলো। পৃথিবীর যত সুখ-আনন্দ-ভালোবাসা সব লিলিকেই উজার করে ঢেলে দিতে বলেছিল! সত্যি, কি ভাগ্যবতী লিলি! বিরল ওর সৌভাগ্য। কত সুখী ও' জীবনে। এতবড় সৌভাগ্য ক'জনেরইবা হয়। চিন্ড়ই করা যায়না! কিন্তু লিলি যা বলছে, সত্যিই কি তাই! সত্যিই কি ওর স্বামী এতবড় রীচ্ ম্যান! ও' যদি সত্যিই স্বামীর সোহাগী হয়, তা'হলে একজন পরপুরুষ ম্যানেজার এ্যান্থনির সাথে ওর এতো কিসের পিরিত! কিসের এতো ঘনিষ্ঠতা ওর সাথে! আর কেন ইবা ম্যানেজার এ্যান্থনির সাথে ওর এতো গলাগলি, ঢলাঢলি!

ক্ষণিকের নিরবতায় লিলি বলল, -'চুপ কিঁউ হো ব্যাহেনজী! কুছ তুম ভি শুনাও!'

ঈর্ষান্বিত হয়ে বললাম,-'তোমাকে তো সোনার ফ্রেমে বেঁধে রাখা উচিৎ! এমন চাঁদ বদন তোমার, এমন প্রখড় রৌদ্রের উত্তাপে ঝলসে যাবে যে!'

-'মজাক করছ!'

-'তা'হলে তোমার চাকুরির কি দরকার? কিসের অভাব তোমার?'

ঠোঁটের কোণে কৌতূকের হাসি ফুটিয়ে লিলি বলল,-'আরে এয়ার, ওতো স্রিফ টাইম পাস করনেকে লিয়ে! অউর পুরাদিন ঘরমে এ্যকেলা ব্যয়ঠে ব্যয়ঠে কঁরুঙ্গি ভি ক্যায়া! বাল্ বাচ্চা তো হ্যায়ই নেহি!'

ঠাট্টা করে বললাম, -'কিঁউ নেহি হ্যায় ভাই! প্রটেক্ট্ দেওয়া বন্ধ করো, দেখবে জলদি বাচ্চা এসে যাবে!'

আবার সেই মুক্তঝরা হাসি লিলির। মশকরা করে কি যে বলে ফেললাম, হাসতে হাসতে ও' একেবারে গায়ের ওপরেই ঢলে পড়ছে। হাসি আর বন্ধ হয় না ওর।

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com